অশরীরী

BANGLADARSHAN.COM

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥অশরীরী॥

নানারকম অদ্ভুত গল্প হচ্ছিল সেদিন আমাদের লিচুতলার আড্ডায়। কিন্তু সে সব নিতান্ত পানশে গোছের ভূতের গল্প। পাড়াগাঁয়ের বাঁশবাগানের আমবাগানের গোঁয়ো ভূত। সাদা কাপড় পরে রাত্রে দাঁড়িয়ে থাকে– ওসব অনেক শোনা আছে। ওর বেশি আর কেউ কিছু বলতে পারল না।

এমন সময় শরৎ চক্রবর্তী আড্ডায় ঢুকলেন। তিনি আবগারী বিভাগে বহুদিন কাজ করে অবসর গ্রহণ করেচেন। ষাটের কাছাকাছি বয়সে। তান্ত্রিক সাধনা করেন। ঠিকুজি-কুষ্ঠি বিনা পয়সায় করে দেন। কোন রত্নের আংটি ধারণ করলে কার সুবিধে হবে ঠিক ক'রে দেন পরের বেগার খাটতে ওঁর জুড়ি বড় একটা দেখা যাবে না এসব কাজে। লোক অতি সজ্জন, সকলে মানে, শ্রদ্ধা করে। অনেকে ওঁর সামনে ধূমপান করে না।

শরৎবাবু ঢুকে বললেন–এই যে, কি হচ্ছে আজ? যে বাদলা নেমেচে!

শ্যামাপদ মোক্তার বললেন–আসুন আসুন চক্কতিমশায়। আমাদের ভূতের গল্প হচ্ছে বাদলার দিনে। তবে তেমন জমচে না। আপনার তো...

শরৎ চক্রবর্তীমশায় বললেন–আমি একটা গল্প বলতে পারি তবে সেটা ভূতের গল্প নয়। সেটা কিসের গল্প তা আমি জানিনে। আপনারা শুনে বিচার করুন।

BANGLADARSHAN.COM

শরৎবাবুর মুখে, সেই গল্প শুনে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। স্বর্গমর্ত্য যেন একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেল সেই ঘন বর্ষার বর্ষণমুখর মেঘের আভরণ ভেদ করে।

শরৎবাবু বললেন–আমাকে সেবার হঠাৎ জলপাইগুড়ির ওধারে ডুয়ার্স অঞ্চলে বদলি করলে। আমার পরিবারবর্গ তখন ঢাকায়, তাদের ওখানে রেখে জলপাইগুড়ি চলে গেলাম। নতুন জায়গা। সেখানে নিজে না দেখেশুনে কি করে সবাইকে নিয়ে যাই। বিশেষ ক'রে ছেলেমেয়েরা তখন ঢাকা স্কুলে পড়াশোনা করচে।

যেখানে গেলাম সেখানটা জলপাইগুড়ি থেকে অনেক দূর। ছোট লাইনে যেতে হয়, পথে চা-বাগান পড়ে। বনময় অঞ্চল। কিন্তু দূরে সবুজ বনরেখার পটভূমিকায় হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরমালা চোখে পড়ে। বড় নির্জন স্থান। আমি যে জায়গায় গেলাম, তার নাম হলদিয়া। ছোট্ট জায়গা, আমি সেখানে গিয়ে সিনিয়র সাব্‌ইন্‌স্পেক্টরের বাসায় উঠলাম, কারণ, আমার বাসা তখনো ঠিক হয়নি। সে ভদ্রলোকের নাম, রেবতীমোহন মুখুজ্যে, বাড়ি নদীয়া জেলা। বেশ ফর্সা, লম্বা, দোহারা চেহারা। আমায় খুব যত্ন করলেন, দিন কয়েকের মধ্যেই বাসা ঠিক ক'রে দেবেন ভরসা দিলেন।

তৃতীয় দিন সকালে আমায় বললেন–আপনাকে একটা কথা বলি...

–কি?

–আপনার এখন এখানে আসা খুব ভুল হয়েচে।

–কেন বলুন তো?

–আপনি জানেন না কিছু এদেশের ব্যাপার?

–না। কি ব্যাপার?

–এই বর্ষাকালে এখানে ভয়ানক ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর হচ্চে চারিধারে। আপনি নতুন লোক, আপনার তো খুবই জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। দু'একবার জ্বর হোলেই ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর দেখা দেবে। তখন জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। এইরকম এদেশের কান্ড।

–তবে আপনারা আচেন কি করে?

–সেকথা আর ব'লে লাভ নেই। ইচ্ছে ক'রে নেই। আছি প'ড়ে পেটের দায়ে। চাকরি ছেড়ে দিলে এ বয়সে যাবো কোথায়, খাবো কি? আমার দুটি মেয়ে পর পর মারা গিয়েচে ব্ল্যাকওয়াটার ফিভারে। তবুও বদলি পেলাম না। কি করি বলুন শরৎবাবু।

BANGLADARSHAN.COM

–তবেই তো...

–একটু সাবধানে থাকলেই হবে। জলটা গরম না ক'রে খাবেন না বাইরে গিয়ে!

–ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার হোলেই কি মানুষ মারা যায়?

–ভালো চিকিৎসা না হলে বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম। বিশেষ ক'রে এই বর্ষাকালে যাঁরা নতুন আসেন, তাঁদের ধরলে বাঁচানো খুব কঠিন হয়ে পড়ে। আমি এরকম দুটো কেস দেখেচি। দুটোই মারা গেল।

শুনে মনে ভয় হলো। কিন্তু সাবধান হয়েই বা কি করবো। বিদেশে বেরিয়ে কতদূর সাবধান হওয়াই বা চলে। যা থাকে কপালে ভেবে কাজ আরম্ভ ক'রে দিলাম। দশ-বারো মাইল দূরে দূরে গাঁজার দোকান মদের দোকান তদারক করে বেড়াতে লাগলাম।

খুব ভালই লাগছিল। বর্ষার সবুজ অভিযান সরু হয়েচে বনে বনে। কত রকমের ফুল ফোটে। কত ধরনের পাখী ডাকে। দূরে হিমালয়ের তুষারাবৃত কি একটা শৃঙ্গ একদিন দেখা গেল। মিছরির পাহাড়ের মত ঝক্‌ঝক্ করচে সকালের সূর্যকিরণ। তবে রোদ বড় একটা উঠতে ইদানিং আর বড় দেখা যেতো না।

ইতিমধ্যে রেবতীবাবুর চেষ্টায় ভালো একটা বাসা পাওয়া গেল। উঁচু কাঠের খুঁটির ওপর কাঠের তক্তা বসিয়ে তার ওপর বাংলো ধরনের ঘর করা হয়েছে। কাঠের মেজে বেশ শুকনো খট্‌খটে। ঘরটা বেশ বড়। আলো-হাওয়া বেশ আসে।

মনের ভয় ক্রমে কেটে গেল। তখন মনে ভাবি, রেবতীবাবুর ওটা উচিত হয়নি। এখানকার মাটিতে পা দিতে না দিতে অমন ভয় দেখিয়ে দেওয়া কি ভালো হয়েচে? কেন করলেন ওটা রেবতীবাবু? অন্য কোন মতলব ছিল নাকি? সাত-পাঁচ ভাবি।

এখানে আমার এক ব্রাহ্মণ আরদালি জুটলো। নাম দিগম্বর পান্ডে। লোকটা অনেকদিন সেখানে আছে। রান্না করতো খুব ভালো। সে হাট-বাজার রান্নাবান্না সবই করত। কোন অসুবিধা ছিল না।

মাস-দুই পরে সেবার 'বামনাপাড়া নর্থ' বলে একটা জায়গায় আবগারি তদারকে গেলাম। সেটা একটা চা-বাগানের পাশে ছোট্ট বাজার। চা-বাগানটার ট্রাকগুলোর গায়ে লেখা আছে, 'বামনাপাড়া নর্থ টি এস্টেট।' পাহাড়ী একটা ছোট নদী পেরিয়ে আমার গরুর গাড়ি বাজারে গিয়ে থামলো। বেলা তখন দশটা। দুটি মাড়োয়ারী মহাজনের গদি আছে। তারা বন অঞ্চলের উৎপন্ন সওদা করে। দেবেন সামন্ত ব'লে মেদিনীপুরে একজন ব্যবসায়ীর কাঠের কারবার আছে। গাঁজা ও আফিমের দোকান সেই দেবেন সামন্তের ভাই, শশী সামন্তের।

BANGLADARSHAN.COM

ওখানে বসে থাকতে-থাকতেই আমার শরীর কেমন খারাপ হোলো। মাথা ধরলো। দেবেন সামন্তকে বলতে সে কি একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিলে। বললে, এতেই সেরে যাবে। কোনো ভয় নেই।

আমি বললাম—আপনাদের এখানে ব্ল্যাকওয়াটার হয়?

খুব।

—মানুষ মরে?

—তা মন্দ মরে না।

—আপনারা ভয় পান না?

—আমরা অনেকদিন আছি। নতুন যাঁরা আসেন, তাঁদের ভয় একটু বেশি।

সবাই দেখছি একই কথা বলে। গাঁজার হিসেব চেক করতে করতে আর যেন বসতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ি। জল-তেষ্টা পাওয়াতে বামনপাড়া নর্থ চা-বাগানের একটা গুমটি টিনের শেড থেকে জল চেয়ে খাই এক নেপালী দরওয়ানের কাছ থেকে।

যখন বাসায় পৌঁছলাম তখন বেলা গিয়েচে। আমার তখন খুব জ্বর। পথেই ক্যাম্প দিয়ে জ্বর এসেছে। খবর পেয়ে রেবতীবাবু ছুটে এলেন। ডাক্তার ডাকা এলো। ওষুধ ও ইন্‌জেকসান চললো। তিনদিনের মধ্যে জ্বর ছেড়ে গেল।

দিন পনেরো বেশ আছি।

সবাই বল্লে-ঠাণ্ডা লেগে অমনটা হঠাৎ হয়েছিল। ও কিছু না।

আমিও নিজেকে সেইভাবেই বোঝালুম। আবার বেশ কাজকর্ম করি। শরীরে কোন গ্লানি নেই। একদিন হলদিয়া পুলিশ-থানার দারোগার সঙ্গে গল্প করচি, হঠাৎ আবার জ্বর এলো। দারোগাবাবু লোক দিয়ে আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

আরদালি দিগম্বর পাঁড়েকে বললাম—জল দাও। জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম, তিনদিন ভীষণ জ্বরের ঘোরে কাটলো। রেবতীবাবু এবং থানার দারোগাবাবু দু'বেলাই আসতেন। কিভাবে আমার সাবু বার্লি তৈরী করতে হবে, আমার আরদালিকে শিখিয়ে দিয়ে যেতেন। তিনদিন পরে জ্বর কমে গেল।

ক্রমে বেশ সেরে উঠলাম। কাজকর্ম আবার সুরু ক'রে দিলাম। দিন পনেরো পরে চাবাগানের একটা আবগারী কেস দেখতে গিয়েছি, আবার হঠাৎ জ্বর এলো। এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম।

BANGLADARSHAN.COM

এখানকার জ্বর ভেল্কিবাজীর মত আসে, আবার ভেল্কিবাজীর মত চলে যায়। সুতরাং প্রথম প্রথম জ্বর এলে আমার যে রকম ভয় হোতো, এখন গা সওয়ার দরুন সে ভয় একেবারে নেই। আরদালিকে ডেকে বলে দিলাম, আগের মত পথ্য প্রস্তুত ক'রে আমাকে যেন খাওয়ায়।

এবার কিন্তু একটু অন্যরকম হলো।

অত সহজে এবার আমি নিষ্কৃতি পেলাম না। দিন দুই পরে উৎকট ব্ল্যাকওয়াটার জ্বরের সব লক্ষণগুলি আমার মধ্যে ফুটে বেরুলো। অতিরিক্ত রক্তপতনের দরুন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লাম। সেরে উঠতে পাঁচ-ছ'দিন লেগে গেল। দিন দুই পথ্য করার পর একদিন সকালবেলা আমার সঙ্গে রেবতীবাবু আর দারোগাবাবু দেখা করতে এলেন। আরদালিকে চা ক'রে দিতে বললাম, কিন্তু তাঁরা চা খেলেন না। পরে বুঝেছিলাম তাঁরা চা খাননি—ব্ল্যাকওয়াটারকে ছোঁয়াচে জ্বর ভেবেই। দারোগাবাবু বললেন—শরৎবাবু, একটা কথা বলি।

—বলুন।

—আপনি এখান থেকে চলে যান।

—কেন বলুন তো?

—ডাক্তারবাবুর তাই মত।

–আমাকে তো কিছু বলেননি।

দারোগাবাবু ইতস্তত ক'রে বললেন–না, আপনাকে বলেননি। আমাদের বলেচেন আপনাকে বলবার জন্য কিনা। তাই বলা উচিত ভাবলাম। উনি বলেচেন, আপনার অসুখ খুব খারাপ। মানে–

–আমি তো সেরে গিয়েচি।

–ও সারা বড় কঠিন শরৎবাবু।

–বেশ, তাহলে স্টেশন পর্যন্ত আমি যাবো কি করে? রক্ষিয়াঘাট পার হবার তো কোন উপায় দেখিনি।

–কিছু ভাববেন না। স্ট্রেচার জোগাড় করছি চা-বাগান থেকে। কুলী পাঠাবো। পুলিশের একজন লোক সাথী থাকবে, আপনাকে ট্রেনে উঠিয়ে না দিয়ে তারা ফিরবে না।

–বেশ।

আমি তখন জানতাম না যে, আজই আমার জীবনের শেষদিন, হোতো, যদি–

কিন্তু সে কথা ক্রমে বলচি।

BANGLADARSHAN.COM

আমি সম্মতি দিলে দারোগাবাবু চলে গেলেন।

তখন বেলা ন'টা হবে। গরম জল ক'রে নিয়ে আসতে বললাম আরদালিকে, গা-হাত মুছবো ব'লে। তারপর একবাটি বার্লি খেলাম। আরও একটু বেলা হোলে দুটি ভাতও খেলাম।

বেলা বারোটার পর লোকজন এলো স্ট্রেচার নিয়ে। এই পর্যন্ত ব'লে শরৎ চক্রবর্তী বললেন–একটু চা খাবার ইচ্ছে হচ্চে।

আমরা বললাম–গল্পটা শেষ করুন।

–চা খেয়ে নিয়ে বলবো। এইবার গল্পের আসল অংশটাতে এসে গিয়েছি কিনা, একটু গলা ভিজিয়ে নিয়ে বলি।

নিতাইবাবু উকিল বললেন–একই কথা। আপনি বললেন, ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর হলো, সেরে গিয়ে আপনি পথ্য করলেন, অথচ ডাক্তারবাবু কেন আপনার অসুখ খারাপ বললেন? অসুখ তো সেরে গিয়েছিল।

–সেরে গিয়েছিল কি রকম সেবার, এখুনি সেটা শুনলে বুঝতে পারবেন। আসলে সারেনি।

–তবে পথ্য দিয়েছিল কেন ডাক্তার?

–এ কথার জবাব আমি দিতে পারবো না। কাউকে জিগ্যেসও করিনি। তবে যেমন ঘটেছিল, সেইরকম বলে যাচ্চি–

–এটা একটা অদ্ভুত কথা বলচেন আপনি। কিরকম সে-দেশের ডাক্তার বুঝলাম না মশাই!

–এ কথাটা আমিও কখনো ভেবে দেখেনি। আচ্ছা, এবার বলি গল্প। শরৎ চক্রবর্তী পুনরায় গল্প আরম্ভ করলেন:

বেলা বারোটার পর স্ট্রেচার নিয়ে এলো চা-বাগানের লোকজন। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন রেবতীবাবু ও দারোগাবাবু। আমি আরদালি জিনিসপত্র গোচ্ছাচ্চি এমন সময় আমার এলো জ্বর। ভীষণ কম্পজ্বর। আর আমি বসতে পারলাম না। ঘরের মধ্যে গিয়ে তাড়াতাড়ি বাঁধা বিছানা আরদালিকে দিয়ে খুলিয়ে পাতিয়ে শুয়ে পড়লাম। এবার আমি আর কিছুই জানিনে। আমার সমস্ত চৈতন্য লুপ্ত হয়ে গেল এক ঘন অন্ধকারের আবরণের অন্তরালে।

যখন আবার আমার জ্ঞান হলো, তখন দুটো জিনিস আমার চোখে পড়লো প্রথমেই। অন্ধকারের মধ্যে একটা কি গাছের ডাল পাশের জানালার বাইরে হাওয়ায় দুলচে। দ্বিতীয় জিনিস হলো, আমার বাক্স ও পুঁটুলি আমার পায়ের দিকে দেওয়ালের কাছে রয়েচে এবং আমার ছাতিটা দেওয়ালের কোণে হেলানো রয়েচে।

BANGLADARSHAN.COM

আমি কি রেলওয়ে ট্রেনে উঠেছি?...

কিন্তু এত অন্ধকার কেন রেলের কামরা? অন্য লোকই বা নেই কেন কামরায়? তারপর আস্তে আস্তে আমার মনের আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে আসতে লাগলো। আমার মনে পড়লো যে, আমি স্ট্রেচারে, আদৌ উঠিনি, জ্বর আসাতে ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিলাম।

কিন্তু ঘরই যদি হয় আরদালি দিগম্বর কই? ঘরে আলো জ্বালেনি? আমি কোথায়?

তৃষ্ণা পেয়েছিল। ডাকতে গেলাম ওকে। গলায় স্বর আটকে গেল। দুবার ডাকতে গেলাম, দুবারই তাই হলো।

আমার মনে হোলো বাইরে চাঁদ উঠেছে। জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে চাঁদের সামান্য আলো এসে পড়েচে। কিছুক্ষণ সামনের দিকে চেয়ে রইলাম, ঘরের মধ্যে বা বাইরে কোথাও কোন শব্দও নেই।

হঠাৎ আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হোলো বাইরের দিকে। কে ওখানে বাইরে?

এই দেখুন, এতদিন পরে মনে পড়েও আমার গা শিউরে উঠলো। দেখলাম কি জানেন, একটি কালো মত মেয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আমার ঘরের চারিপাশে ঘুরছে, আর একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে কি করচে–দুবার আমার সামনের দরজার ফাঁক দিয়ে সে নীচু হয়ে ঘুরে গেল।...তিনবারের বার মেয়েটি হঠাৎ মুখ উঁচু করে

আমার দিকে চেয়ে হাত নেড়ে বললে–কোনো ভয় নেই–গন্ডি দিচ্চি–আজ রাত্রে কেউ গন্ডির মধ্যে আসতে পারবে না–ঘুমো–

অতি অল্পক্ষণের জন্যে মেয়েটিকে চোখের সামনে দেখলাম, তারপর সে ঘুরে গেল ওদিকে। আমারও আর জ্ঞান রইল না। ঘুমিয়ে পড়লাম কি?

এরপরে কতক্ষণ পরে জেগে উঠেছিলাম তা বলতে পারবো না, কিন্তু তখন চোখ খুলেই দেখলাম, সেই কালো মেয়েটি আমার শিয়রের কাছে ব'সে। তার বয়েস আঠারো বছরের বেশি হবে মনে আমার মনে হলো না। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, মেয়েটি যেন খুব ঘেমেচে, ওর মুখ ঘামে ভিজে গিয়েচে যেন, সারা শরীর দিয়ে যেন দরদর করে ঘাম ঝরচে...

আমি ওর দিকে চেয়ে দেখতেই মেয়েটি চমৎকার শান্ত স্নেহময় সুরে বলে উঠলো–জাগলি কেন? ঘুমো-ঘুমো-কোনো ভয় নেই-ঘুমো–

শেষবার যখন ও 'ঘুমো' বলেছে তখন আমি ঘুমিয়ে পড়লাম ওর কথা শুনতে শুনতে। ঘুমিয়ে পড়বার আগে সেই গাছের ডালটার দিকে নজর পড়লো জানলার বাইরে। তার গায়ে জ্যোৎস্না পড়েচে...।

এইখানেই আমার গল্প শেষ হলো।

BANGLADARSHAN.COM

সকালে আমি যখন জেগে উঠলাম, তখন আমার মনে হোলো স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় ঘুম থেকে আমি জেগে উঠেছি।

আমার শরীরে কোনো গ্লানি নেই। কিন্তু শরীর বড় দুর্বল। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলাম না। ক্রমে ক্রমে একটু বেলা হোলো। তখন দেখি দিগম্বর পাঁড়ে আরদালি সন্তর্পণে পা টিপে এসে ঘরের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। আমি ডাকতেই যেন সে চমকে উঠলো, কোনো উত্তর দিল না। আমি বললাম–রেবতীবাবুকে ডেকে নিয়ে এসো।

থতমত খেয়ে সে যেন চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে অনেক লোক এলো আমাকে দেখতে। তার মধ্যে রেবতীবাবুও ছিলেন।

রেবতীবাবু বললেন–কেমন আছেন শরৎবাবু?

–ভালো। আমি কিছু খাবো।

তখনই রেবতীবাবু বাইরে গিয়ে কাকে কি বললেন। খানিক পরে এক বাটি বার্লি এলো আমার জন্যে। বার্লি খেয়ে শরীরে বল পেলাম। ডাক্তার এসে পরীক্ষা ক'রে বললেন, জ্বর ছেড়ে গিয়েচে।

এর দিন-দুই পরে আমি সম্পূর্ণ নীরোগ হয়ে উঠলাম। পথ্যও করলাম। তখন ক্রমে ক্রমে শুনলাম, সেই ভীষণ রাত্রে আমাকে মূমুর্ষু মনে ক'রে সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল একা ফেলে। ডাক্তারবাবু

বলেছিলেন রাত কাটবে না। এমন কি, নাকি সকালে আমার সৎকারের জন্যে কে কে যাবে, কোথায় কাঠ পাওয়া যাবে, এসব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিল। সকালেই লোক পাঠিয়ে আমার পরিবারবর্গকে টেলিগ্রামে আমার মৃত্যু সংবাদ জানানোর জন্যে থানা থেকে একজন কনেস্টেবল পাঠাবেন, দারোগাবাবু তাও ঠিক ক'রে রেখেছিলেন।

অথচ সেই নির্বান্ধব, পরিত্যক্ত অবস্থায় কে আমার মৃত্যুশয্যার পাশে সারারাত বসেছিল, কে আমার ঘরের চারিধারে গন্ডি এঁকে দিয়েছিল আমাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে...সবাই পরিত্যাগ করলেও এক আমাকে সেই অসহায় অবস্থার মধ্যেও পাহারা দিয়েছিল...এ সব প্রশ্নের কোনো জবাবই আমি দিতে পারবো না।

যদি আপনারা বলেন, সবটাই জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছি–তারও কোন প্রতিবাদ আমি করতে চাই না। স্বপ্ন যদি হয়, বড় মধুর, বড় উন্নত ধরনের উদার স্বপ্ন দেখেছিল আমার মূমুর্ষু মন। সে স্বপ্নের ঘোর আমার সারাজীবন চোখে রইল মাখা। মস্ত বড় একটা আশার বাণী দিয়ে গেল প্রাণে।

শরৎ চক্রবর্তী চুপ করলেন। মনে হোলো তাঁর চোখে যেন জল চক্‌চক্‌ করছে। উকিল নিতাইপদ রাহা বললে–সেরে উঠে হলদিয়াতে আপনি ছিলেন কতদিন?

BANGLADARSHAN.COM

–যতদিন গবর্ণমেন্ট আমাকে বদলি না করেছিল? প্রায় দু'বছর।

–এভাবে একা ছিলেন বাসায়?

–আমি আর দিগম্বর। আর কেউ না।

–আর কোনোদিন কিছু দেখেছিলেন?

–না।

–আর অসুখে ভুগেছিলেন?

–না।

ঘন বর্ষার রাত। বাইরে বেশ অন্ধকার। জোনাকি জ্বলছিল উঠানের শিউলি গাছটার ডালে পাতায়। আমরা সবাই অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। নিতাই উকিলও আর বেশী কথা বলেনি। বৃষ্টি এসে পড়বে ব'লে শরৎ চক্রবর্তীকে আমরা বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম ছাতি দিয়ে।

॥সমাপ্ত॥